Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.119-125
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ভারতীয় জাতির বিশেষ প্রকৃতি সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য ও বিশ্লেষণ

সাহিন সুলতানা
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Swami Vivekananda was an Indian Vedantic philosopher and nationalistic thinker.Refuting the western concept of militaristic nation,he introduced an unique concept of nation in India based on her glorious civilizational past and religion.He desired for an united,strong and spiritualistic nation abolishing the tyranny of distorted caste system in India.He exposed the self-centric,urbanistic and western-maniac freedom fighters and their ignorance to destituate situations of rural people in india.He advocated for spiritualistic freedom/moksha over political and economical freedom in india.He portrayed a picture of an united nation in India having some virtues like service to man,mutual love, respect and tolerance among masses.He also wanted the people in Indian nation to be respectful towards women folk,various religions,traditions and culture.This paper specifically wants to explore these perspectives.

Keywords: Vivekananda, Vedantic, militaristic nation, spiritualistic nation, caste system, service.

আজ আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫ বছর বা 'আজাদির অমৃত মহোৎসব' পালন করছি। কিন্তু আজ থেকে ৭৫ বছর পূর্বে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলেও, কিভাবে সেটি সম্ভব হল তা অনুধাবন করা বিশেষ প্রয়োজন। মুসলিম সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির সম্প্রসারণ ঘটে। প্রথমদিকে ব্যবসায়িক বা অর্থনৈতিক কারণে ভারতীয় সমাজে ব্রিটিশদের অনুপ্রবেশ ঘটলেও পরবর্তীকালে তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করে। অজ্ঞ, অচেতন ভারতীয়দের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্রমশ ব্রিটিশদের কুক্ষীগত হয়ে যায়। অপারগ ভারতবাসী তাদের অজ্ঞতার দোহাই দিয়ে অনেকাংশেই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ভারতবর্ষ তথা বাংলার এই সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের ইতিহাসে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করতে উনবিংশ শতকের প্রথমের দিকে আবির্ভাব ঘটে রাজা রামমোহন রায়ের। আর এই রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই রাষ্ট্রচিন্তার নতুন দিক নিয়ে ভারত উদ্ধারের কাজকে ত্বরান্বিত করতে আবির্ভাব ঘটে স্বামী বিবেকানন্দের।[১]

নরেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ - ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ) অধিক প্রচারিত একজন বৈদান্তিক হিসাবে। বেদান্ত প্রচারে তার উদ্দেশ্য ছিল - 'ধর্মের নব মূল্যায়নের সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় চেতনার সঞ্চার।'[২] সমকালীন দুর্দশাময় ভারতে অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার কল্পে ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধকরণের তাঁর

যে প্রচেষ্টা তা আজও স্মরণীয়। তাঁর বেদান্ত প্রচারের মূল লক্ষ্যই ছিল ভারতীয় সমাজের সংস্কারসাধন। তবে আনুষ্ঠানিক বা বাহ্যিক সংস্কারের পরিবর্তে বিবেকানন্দ মানুষের চরিত্রগত সংস্কার ও চেতনার উৎকর্ষ বিধানের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি নিজে জীবনে যে সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাই প্রচার করেছিলেন।

বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জাতির তুলনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, প্রত্যেক মানুষেরই একটা ভাব আছে ; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাঁর মতে, জাতি হল ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র। ভারতীয় সমাজ নিয়ে আলোচনা কালে বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজ গঠন সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা দিয়ে শুরু করেন। তাঁর মতে, "ভারতীয় সমাজ গঠনের পূর্বে সমগ্র উত্তর ভারতে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির একাধিক জাতি বাস করত, ক্রমে এদের মধ্য থেকেই আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাপূর্ন একটি জাতির জন্ম হয়"।[৩] অন্যদের থেকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক থেকে উন্নত এই জাতি গোষ্ঠী নিজেদের 'আর্য' নামে চিহ্নিত করে এবং তাদের গোষ্ঠীকেন্দ্রীক জীবনে আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা সমাজ গঠন করে। এইভাবে সৃষ্ট ভারতীয় সমাজ ছিল স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন, কারণ যখন পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলি সামরিক শ্রেনীকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছিল, তখন ভারতীয় সমাজের প্রধান স্থান লাভ করেছিল আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ পুরোহিত শ্রেনী। আবার অন্যান্য সমাজে যেখানে ব্যক্তি ছিল সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি, সেখানে ভারতীয় সমাজ উন্নয়নের ভিত্তি ছিল গোষ্ঠীকেন্দ্রীক।

ভারতীয় সমাজের এই আর্যগোষ্ঠী যেমন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়; তেমনি ভাষাগত, সাহিত্যগত ক্ষেত্রেও একাধিক ধারনা সমাজে সংশয়ের সৃষ্টি করে। সমাজের মানুষরা যাতে নিজ সুখের জন্য সমাজ বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে ব্যবহার না করতে পারে, তাই আর্য সমাজের স্থপতিরা সমাজে ব্রাহ্মণত্বর ধারণা প্রচারিত করেন। যেখানে কোন বিশেষ বর্ণের সদস্যদের ব্রাহ্মণ বলা হত না৷ আধ্যাত্মিক দিক থেকে আলোকপ্রাপ্ত হওয়াই ছিল ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক। তাই প্রাচীন ধারনানুযায়ী সেই সময় ভারতীয় সমাজে মানুষের সামর্থ্য ও মানসিক গঠন অনুসারে সমাজে বর্ণ ব্যবস্থা আসে। অতীতের ব্রাহ্মণত্ব বা আধ্যাত্মিকতা অর্জনকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে রেখে মানুষকে বিভক্ত করা হয় চতুর্বর্ণে, সেগুলি হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। যাদের প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক দায়িত্ব ছিল, এটি ছিল একপ্রকার শ্রমবিভাগ।

স্বামীজী তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" নামক রচনায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে ভারতকে প্রত্যক্ষ করেছেন। বিবেকানন্দের মতে, জাতি হল ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র। ভারতীয় জাতির বিশেষত্ব বলতে গিয়ে তিনি বলেন 'ভারতীয়রা বলবান', ভারতকে তিনি সম্পদশালী জাতি হিসাবেও বিবেচিত করেছিলেন। তবে "আমরা অতি নীচ, আমরা অতি অপদার্থ, আমাদের সব খারাপ" এই ধারনার বিরোধিতা করে তিনি বলেছিলেন "এমন কোন গুন নেই, যা কোন জাতিবিশেষের একাধিকার। তবে কোন ব্যক্তিতে যেমন, তেমনি কোন জাতিতে কোন কোন গুনের আধিক্য প্রাধান্য।"[৪]

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে 'জাতি' বলতে আমরা কি বুঝি। যদি আমরা বঙ্গীয় তাত্ত্বিকদের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নেশন' বা জাতিকে একটি 'সজীব সত্তা' হিসাবে উপলব্ধি করে বলেছেন জাতির গঠন বা আর্বিভাব মানুষের মতোই হয়ে থাকে। সুদীর্ঘ অতীতের প্রয়াস, ত্যাগস্বীকার ও নিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে। যাই হোক না কেন জাতি হল রাষ্ট্রের অধীনস্ত এক সুগঠিত

জনসমাজ। ভারতীয় জাতির বিশেষ প্রকৃতি সম্পর্কে বিবেকানন্দের বক্তব্য কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। ভারতীয়রা ইংরাজদের হাতে শোষিত এক জাতি। তবে এই শোষণের জন্য বিবেকানন্দ বর্তমান অভিজাত ভারতীয়দের পূর্বপুরুষগণকেই দায়ী করেছেন, কারণ সেই সমস্ত মানুষদের দ্বারা সাধারন লোকরা এমন নিষ্ঠুর ও নির্মমভাবে শোষিত হয়েছে, যে তাঁরা প্রায় ভুলেই গেছেন যে তাঁরাও মানুষ। তাদের মানসিকতা এমন রূপ নিয়েছিল যে, তাঁরা মনে করত যে অভিজাতদের জন্য জীবন দেওয়া হল তাদের কর্তব্য, অভিজাতদের গোলাম হয়ে থাকার জন্যই বোধহয় তাদের জন্ম। ভারতের সাধারন মানুষদের এই অসহায় পশুসুলভ অবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই অভিজাতরাই পশ্চিমী কিছু অর্থহীন ভাবধারা এনে তাদের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে।[৫]

ভারতীয় জাতির প্রকৃতি অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিবেকানন্দ জাতীয়তাবাদীদের কড়া তিরস্কার করেছেন, কারণ ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ভারতের অবনতির জন্য অপর লোকদের দায়ী করেন, সাথে সাথে তারা ছিলেন ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অবনতি তথা অসহায়তা সম্পর্কে সম্পূর্ন উদাসীন। প্রথমদিকে বিবেকানন্দ মনে করতেন যে, জাতীয়তাবাদীদের নিজস্বার্থ পূরন বা রক্ষা করাই হল দেশপ্রেম। কারন তাঁর চোখে জাতীয়তাবাদীরা ছিল অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভূক্ত।

ভারতে যারা বাস করে তারাই ভারতীয়। ভারতীয়দের চরিত্রগত বা প্রকৃতগত বিশিষ্টতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ পশ্চিমী সভ্যতার সাথে বারংবার তুলনা করেছেন। ত্রিশ কোটি ভারতীয়, যাদের স্বামীজী "মানব প্রায় জীব" হিসাবে বর্ণনা করেছেন তারা সত্যিই অপরের শিকার। তাদের চাওয়া বলতে শুধু জীবনধারণ আর্থিক অনগ্রসরতাই তাদের নিরাশার কারন। বিবেকানন্দ বিভিন্ন দিক থেকে এই ভারতীয়দের বিশিষ্টতা তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন এই ভারতে অতীতে ধর্মের সাথে মোক্ষ ছিল সম্পৃক্ত। কিন্তু বর্তমান ভারতে ধর্ম, মোক্ষকে ত্যাগ করেছে।

বিবেকানন্দের কাছে কোন জাতি গঠনে যেটি সবথেকে বেশী গুরুত্বপূর্ন তা হল জাতীয় ভাব বা আদর্শ। ফ্রান্সের নাগরিকদের স্বাধীনতার বাসনাই তাদের প্রগতির লক্ষ্যন বলে তিনি মনে করতেন। অপরদিকে ইংরাজ জাতির মধ্যে স্বাধীনতার লক্ষন থাকলেও তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের সংরক্ষনের প্রচেষ্টাই জাতীয় আদর্শ হয়ে মাথাচাড়া দিয়েছিল। ফরাসী ও ইংরাজ জাতির সাথে বিবেকানন্দ হিন্দু জাতির তুলনা করে দেখিয়েছেন যে হিন্দুদের কাছে মুক্তিই হল প্রকৃত বা চূড়ান্ত স্বাধীনতা। এই জাতির বিশেষত্ব এটিই যে এদের কাছে রাজনৈতিক বা সামাজিক স্বাধীনতার চেয়ে পারমাত্মিক স্বাধীনতা তথা মুক্তি বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। তাই এই পারমাত্মিক স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হলে, হিন্দুদের কাছে তা অসহনীয় হয়ে পড়ে। যার উপর ভিত্তি করেই হিন্দু জাতি উপরে ওঠার চেষ্টা করে থাকে।

ভারতীয় জাতির বিশেষ প্রকৃতি অনুধাবন করতে গিয়ে বিবেকানন্দ একটি বিষয় স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে জাতীয় জীবনের ভালো গুনাবলীই সেই জাতির উন্নতির পক্ষে সহায়ক হতে পারে। ভারতীয় জাতির যে মহত্ব, তার পশ্চাতে তিনি তাদের সততা, নিষ্ঠা, অহিংসা, ও সৌভ্রাতৃত্বকে স্বীকার করেছিলেন। কোন জাতির টিকে থাকার উপায় হিসাবে তিনি পরমত সহিষ্ণুতা বা অপর ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাবের উপর জোর দিয়েছিলেন। কোন জাতির পক্ষে বড় হতে গেলে যে বৈশিষ্ট্য গুলি অতিআবশ্যক বলে বিবেকানন্দের মনে হয়েছিল তা হল –

"১) সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস।

২) হিংসা ও সন্দিগ্ধ ভাবের একান্ত অভাব।

৩) যাহারা সৎ হইতে কিংবা সৎ কাজ করিতে সচেষ্ট, তাহাদিগের সহায়তা।"[৬]

বিবেকানন্দ জাতির উন্নতির এই সকল পন্থার প্রতি দিক নির্দেশ করলেও হিন্দু জাতির বুদ্ধি ও অন্যান্য গুন থাকা সত্ত্বেও কেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তা অনুধাবন করতে গিয়ে দেখান, এর কারন হল "হিংসা"। পারস্পরিক হিংসাপরায়নতা ও ঈর্ষাসুলভ মনোভাবই হিন্দু জাতির দুরবস্থার অন্যতম কারন বলে বিবেকনন্দ মনে করতেন। তাই ভারতীয়দের জন্য তিনি সর্বপ্রথম "হিংসা না করিবার শিক্ষা লাভের কথা বলেন। ভারতীয়দের পারস্পরিক স্নেহ ভালোবাসার সূত্রে আবদ্ধ করলে অজ্ঞতা, কথা বলেন। ঘৃনা, মুর্খতা, জাতিবিদ্বেষ ও হিংসার মতো পাশবিক মনোবৃত্তিকে খন্ডন করা যাবে বলে বিবেকানন্দের মনে হয়েছিল।

একথা ঠিক যে বিবেকানন্দ ব্রিটিশের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার জন্য ভারতের সংগঠিত জাতীয় সংগ্রামে কখনই প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহন করেননি, তবে তার মানে কিন্তু এই নয় যে ভারত মুক্তি তাঁর আকাঙ্খা ছিল না। বরং এক স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ন ও আত্মমর্যাদায় পরিপূর্ন ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন তিনি। ভারতীয়দের আত্মিক প্রগতির মাধ্যমেই তিনি ভারতবর্ষের বিকাশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভারত সম্বন্ধে তাঁর ছিল অপার শ্রদ্ধা আর সেটি ধরা পড়ে তাঁরই বক্তব্যে "...আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি ধর্ম ও দর্শনের দেশ - ধর্মবীরগণের জন্মস্থান, ত্যাগের ক্ষেত্র। শুধু এই দেশেই সুদূর অতীত হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানব জীবনের মহত্তম আদর্শগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে"। তিনি আরো বলেন "যখন গ্রীসের জন্ম হয় নাই, রোমের কথা কেহ ভাবে নাই, বর্তমান ইওরোপীয়দের পূর্বপুরুষগন বিচিত্র অঙ্গরাগে রঞ্জিত অসভ্য অরন্যবাসী মাত্র ছিল, সেই সূদুর যুগেও ভারত তার সংস্কৃতির সাধনায় কর্মমুখর। তাহারও পূর্বে, যে দূর অতীতের খবর ইতিহাসে পাওয়া যায় না, যাহার কুয়াশা ভেদ করিতে কিংবদন্তীও সংকুচিত, সেই সময় হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত কত উচ্চ উচ্চ ভাব শান্তি ও শুভেচ্ছার বানী বহন করিয়া ভারত হইতে জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা কর - সেখানেই কোন সুমহান আদর্শের সন্ধান মিলিবে, দেখিতে পাইবে উহার জন্ম ভারতবর্ষে। ...সত্যই আমাদের মাতৃভূমির কাছে জগতের ঋণ অসীম।"[৭] বিবেকানন্দের এই বক্তব্য থেকে এটিই স্পষ্টই প্রতীয়মান যে ভারতীয়দের প্রকৃতি ছিল সত্যই স্বতন্ত্র এবং তা অবশ্যই অভিনবত্বের দাবীদার।

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতীয়দের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য হল মুক্তি লাভ হিন্দু সভ্যতার অভ্যন্তরে বৌদ্ধ, জৈন, দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদী সকলের মধ্যে এই একটি বিষয়ে সহমত লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগের প্রারম্ভে ভারতের শাসনক্ষমতা যে অন্য জাতির হস্তগত হয়েছিল,তার জন্য এই মুক্তিলাভের প্রচেষ্টাই দায়ী। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতীয় জাতির বিশেষ প্রকৃতি অনুধাবন কালে যে সকল বিষয় এসেছিল, তাতে পোষাক, পরিচ্ছনতা ও স্থান পেয়েছিল। বাহ্যিক পরিচ্ছনতা বিদেশে বেশী সমাদৃত হলেও ভারতের আপাদমস্তক পরিচ্ছনতাকেই অধিকতর শ্রেয় বলা যায়। অনুরূপভাবে তিনি দেখিয়েছেন "গরিবরা খাবার জোটে না বলে অনাহারে মরে। ধনীরা অখাদ্য খেয়ে অনাহারে মরে...।"[৮] পাশ্চাত্যের সাথে প্রাচ্যের এই তুলনায় তিনি খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি গ্রহনেও ভারতীয়দের বিশেষত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

ভারতীয় জাতির প্রকৃতি বর্ননা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ "বর্ণাশ্রম" ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। এ বর্নাশ্রম ব্যবস্থা ভারতীয়রা লাভ করেছিল আর্যদের কাছ থেকে। ভারতে আর্য আগমনের পরবর্তী কালেই এই বর্ণবিভাজন চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা প্রকট হয়ে ওঠে। বিবেকানন্দ বলেছেন "ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র - চারি বর্ণ

পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে। প্রত্যেক বর্নেরই রাজত্বকালে কতকগুলি লোকহিতকর এবং অপর কতকগুলি অহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান হয়।"[৯] কালের অভিঘাতে মুসলিম শাসনের অবসানে ভারতে অধিষ্ঠান ঘটে এক অভিনব শক্তির। এই অভিনব শক্তি হলো ব্রিটিশ শক্তি। এই ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে বৈশ্য সম্প্রদায়, যে কিনা অতি সম্পদশালী হলেও সর্বদা 'বদ্ধহস্ত ও ভয়ত্রস্ত' হয়ে থাকতো, তারা আপন বুদ্ধি ও অর্থবলে ক্ষত্রিয়রাজকে নস্যাৎ করে দেয়। ভারতীয় রাজকূল হয়ে ওঠে তাদের ভৃত্য। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আজ্ঞাবহনকারী হিসাবে দেশীয় নৃপতিরা টিকে থাকেন মাত্র। যাই হোক্ না কেন ব্রাহ্মন ও ক্ষত্রিয় আধিপত্যে ভারতে যে বিদ্যা ও সভ্যতার উন্নয়ন ঘটেছিল, বৈশ্য আধিপত্যে সেই প্রকার উন্নয়ন ঘটে ধনের। আর যাদের শারীরিক শ্রমের উপর ভিত্তি করে ব্রাহ্মনের ক্ষমতা, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য এবং বৈশ্যের ধনলাভ সম্ভব তাদের কথা কেউ মাথায় রাখেনি। যারা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু তাদের বিদ্যা লাভের ইচ্ছা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত, তারা ঘৃণিত জীবন যাপনের মাধ্যমে ভারবাহী পশুর সাথে তুলনীয় ছিল। অপরাপর তিনটি বর্নে বিদেশীদের আধিপত্য থাকলেও ভারতবাসীদের কপালে জুটেছিল শুধুমাত্র 'শূদ্রত্ব'। এই শূদ্র বহুল ভারত সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলেন "এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রানে আশা নাই ; আছে প্রবল ঈর্ষা, জাতিবিদ্বেষ, আছে দুর্বলের 'যেন তেন প্রকারেন' সর্বনাশ সাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে। এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য - প্রদর্শনে - আচারে, কর্ম পরের দাসত্বে ভক্তি স্বার্থসাধনে, জ্ঞান অনিত্যবস্তু সংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কর্ম পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরনে, বাগ্মিত্ব কুট ভাষনে, ভাষায় উৎকর্ষ ধনীদের অত্যদ্ভুত চাটুবাদে বা জঘন্য অশ্লীলতা-বিকিরণে।"[১০] বর্তমান ভারতীয়দের প্রকৃতি আনুধাবন করে বিবেকানন্দ উপরিউক্ত মন্তব্যগুলি করলেও তাঁর আশা ছিল যে শূদ্ররা ধর্ম-কর্মের সাথে সমাজে একাধিপত্য লাভ করবে। পাশ্চাত্যে যার পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে সমাজতন্ত্র, নৈরাজ্যবাদ উদ্ভবের সাথে সাথে।

পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের বিপুল ক্ষমতা অনুধাবন করে বিবেকানন্দ মানবসভ্যতায় এর অবদানকে ও অস্বীকার করেননি। পাশ্চাত্য তথা ইউরোপে গনতন্ত্রের বাস্তব রূপ দেখে তিনি একথা স্বীকার করতে নারাজ ছিলেন যে এই পশ্চিমী ধনতন্ত্র মানব সভ্যতাকে অনেক উচ্চতর আদর্শে পৌঁছে দিচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি ছিল "উপায় তো সব দেশেই এক - অর্থাৎ গোটাকতক শক্তিমান পুরুষ যা করছে তাই হচ্ছে। ...ও তোমার পার্লামেন্ট দেখলুম, সেনেট দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম। ... শক্তিমান পুরুষেরা যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকি গুলো ভেড়ার দল।"[১১] পরক্ষনেই আবার ভারতের বিশেষত্ব সম্বন্ধে তাকে বলতে শোনা গেছে যে ভারতে এই সব হাঙ্গামাগুলি অনুপস্থিত। যার ফলস্বরূপ "রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপীয় দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে নাই।"[১২] বিবেকানন্দের কাছে তাই সব থেকে বেশী গুরুত্ব পেয়েছিল 'শুদ্র শক্তির জাগরণ'। যাদের শ্রমকে ভিত্তি করে ব্রাহ্মনের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের সম্পদ লাভ সম্ভব, সেই শূদ্রদের জাগরনই হবে ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম।

পাশ্চাত্য নারীদের সাথে ভারতীয় নারীর তুলনায় বিবেকানন্দ একটা মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত করেছিলেন। "ভারতে জননীই আদর্শ নারী। মাতৃভাবই এর প্রথম ও শেষ কথা..., পাশ্চাত্যে নারী স্ত্রী, সেখানে স্ত্রীর রূপেই মেয়েদের ভাব প্রকাশ পেয়েছে।"[১৩] আবার পাশ্চাত্য দেশকে নারীর রাজ্য নারীর বল ও নারীর প্রভুত্ব বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতের বাল্যবিবাহ প্রথার কটুক্তি করে তিনি বলেছেন যে পাশ্চাত্যের

মেয়েদের মত মেয়ে পৃথিবীতে নাই, তারা পবিত্র, স্বাধীন এবং দয়াবতী - ভারতীয় পুরুষরা তাদের পায়ের নখের যোগ্যও নয়। 'চিকাগো' ধর্মমহাসভায় প্রাচ্য নারী সম্বন্ধে গিয়ে তিনি বলেন, "কোন জাতির প্রগতির শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি হল নারীদের প্রতি তাহার মনোভাব। প্রাচীন গ্রীসে স্ত্রী পুরুষের মর্যাদায় কোন পার্থক্য ছিল না; পূর্ণ সমতার ভাব বিরজিত ছিল... পূর্ণ স্বাতন্ত্রই ছিল পূর্ণ নারীত্ব। আধুনিক হিন্দু নারীর জীবনের প্রধান ভাব তাহার সতীত্ব... এই আদর্শের চরম অবস্থায় হিন্দু মহিলারা সহমরণে দগ্ধ হইতেন। ... ভারতীয়দের এই নির্লজ্জ পরিণতি সত্যই ভারতীয় চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।"[১৪]

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ব্রিটিশ শাসনের সবচেয়ে বড় কুফল হল ভারতীয়দের মননশীলতার ধ্বংসসাধন। স্বাধীন চিন্তাক্ষেত্রে বিচরণে যে ভারতবাসী অভ্যস্ত ছিল, সেই অবস্থা থেকে এদের সরিয়ে এনেছে ব্রিটিশ শক্তি। ব্রিটিশ শাসনের সর্বাপেক্ষা কুফল বলে বিবেকানন্দ যেটি অভিহিত করেছেন তা হল ভারতীয় সমাজের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় ভাবের অভাব। সেখানে সকল ভারতীয় ইংরেজদের সমগোত্রীয় হবার চেষ্টায় সামিল। দৈহিক পরিচ্ছন্নতায় তাদের অনুকরণ স্পৃহাই দুরবস্থার অন্যতম কারণ।

ভারতীয় জাতির বেশীরভাগই ছিল দরিদ্র, নিরক্ষর। তদুপরি পাশ্চাত্যের সাথে প্রাচ্য তথা ভারতের তুলনায় পশ্চিমী ঐতিহ্যের কতটুকু গ্রহনীয় বা কতটা পরিত্যাগ করা উচিত, সে সম্বন্ধে বিবেকানন্দ ছিলেন নিশ্চুপ। ভারতীয় জাতির বিশেষ প্রকৃতি হিসাবে আধ্যাত্মিকতাকে চিহ্নিত করে কীভাবে দারিদ্র্যমুক্তি ঘটানো যাবে সে চিন্তা করতে বিবেকানন্দ ব্যস্ত ছিলেন। দরিদ্রের প্রতি সমবেদনা এবং শোষিতের প্রতি মমত্ববোধ ছিল তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। অতীত ভারত সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন গর্ববোধ, হিন্দু ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধীয় তাঁর - ভাবধারা ছিল সমকালীন ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের ভাবধারার অনুসারী। সমকালীন ভারতীয় মানসিকতার ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার পার্থক্যকে পরিস্ফুটিত করতে চেয়েছিলেন বিবেকানন্দ। ভারতীয়দের পুর্নজাগরিত করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তাই তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন -"যে ভারতবাসী আজ আত্মমর্যাদাহীন, দরিদ্র,পূর্বপুরুষের অনুপযুক্ত উত্তরাধিকারী, তারা পাশ্চাত্যের কাছ থেকে ঐহিক সুখভোগেচ্ছার শিক্ষা নেবে, সে দিন বেশী দেরী নয় বলেই তাঁর ধারণা ছিল।"[১৫]

তথ্যসূত্র:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন, বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা (২য় খন্ড), জি.এ.ই পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা নং-২২১ দ্রষ্টব্য।
২. গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন, পূর্বোক্তগ্রন্থ, ১৯৯০, পৃষ্ঠা নং-২২১ দ্রষ্টব্য।
৩. রায়, অমিতাভ, 'বিবেকানন্দের ধর্ম, পরম্পরা ও ভারত গঠন', সত্যব্রত চক্রবর্তী সম্পাদিত ভারতবর্ষ ও রাষ্ট্রভাবনা, প্রকাশন একুশে, কলকাতা, ২০০৩।
৪. 'প্রাচ্য ও পাশ্চত্য', স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৮, পৃষ্ঠা নং ১৯৯।
৫. দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬১, পৃষ্ঠা নং-২৬২।
৬. তথ্যসূত্র : 'পত্রাবলী', স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৮, পৃষ্ঠা নং- ৩১১।
৭. স্বামী, বিবেকানন্দ, আমার ভারত অমর ভারত, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০০৭, পৃষ্ঠা নং- ১-৮ দ্রষ্টব্য।

৮. 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২০০৮, পৃষ্ঠা নং-১৩৮।
৯. 'বর্তমান ভারত', স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৮, পৃষ্ঠা নং- ১৮০।
১০. 'বর্তমান ভারত', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২০০৮, পৃষ্ঠা নং-১৮৭-১৮৮।
১১. 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২০০৮, পৃষ্ঠা নং- ১২৬।
১২. 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২০০৮, পৃষ্ঠা নং- ১২৬-১২৭।
১৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৫ম খণ্ড) ২০০৮, পৃষ্ঠা নং-৩৩৫-৩৩৬ দ্রষ্ট্রব্য।
১৪. 'চিকাগো বক্তৃতা', বিষয়-প্রাচ্য নারী; সূত্র: স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (১ম খণ্ড), ২০০৯, পৃষ্ঠা নং- ৩০ দ্রষ্টব্য।
১৫. রায়চৌধুরী, তপন, ইউরোপ পুনর্দর্শন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা নং-২৩২।